পঞ্চাশ ষাট সত্তরের কবিতায় বিকল্প সন্ধান

পরিকথা

পঞ্চাশের কবিতা চর্চায় দুটি পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ - একটি 'শতভিষা' (১৯৫১, সম্পাদক অলোক সরকার, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, তণ মিত্র), অন্যটি 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩, সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী) । সম্পূর্ণ ভিন্ন মের দুটি পত্রিকার মধ্যে 'কৃত্তিবাস' 'বাংলাদেশের তণতম কবিদের মুখপত্র' রূপে অচিরেই যে আলাদা হতে পেয়েছিল তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ১৯৮৪ সালে 'কৃত্তিবাস সংকলন' (১) -এর ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বিদেশি ধাঁচে একটা কোনো বিশেষ নাম দিয়ে কাব্য অন্দোলন আমরা শু করিনি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা নিজেদের মধ্যে কোনোরকম পরামর্শ না করেই যে নতুন রীতিতে কবিতা লিখতে শু করে, তাকে বলা যেতে পারে স্বীকারোত্তিমূলক কবিতা।' প্রায় তিরিশ বছর পর নিজেদের দিকে তাকিয়ে যে 'অ - বিদেশি', স্বীকারোত্তিমূলক উচচারণকে চিহ্নিত করেছেন সুনীল, হয়তো সেই দেশকাল - স্পর্শিতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর অথবা পঞ্চাশের কবিদের প্রকৃত পরিচয়। রাজনৈতিক দলাদলি, আদর্শ ও বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই দেশ - যাত্রা হয়তো আরেক ধরনের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায়, তবু বলতেই হয় 'কৃত্তিবাস' --এর পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ যেদিকটিতে দৃষ্টি অ াকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন (২), তাঁর অনুল্লেখ্য ইঙ্গিতে সেই দিকটি নিশ্চিতভাবেই উত্তর ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও কাব্যিক অনুষঙ্গগুলি। যার 'মহিমা' 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' নামের প্রবন্ধে সমর সেনও সেভাবে বুঝতে পারেননি বলেই প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' নামের প্রবন্ধে তৎকালীন কবিতায় বিদেশি কেতাবি অভিজ্ঞতার ফাঁদে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন। সমর সেন লিখেছেন, 'তিরিশ শতকের (দশকের) কবিদের উপর প্রভাব ছিল এলিয়ট, পাউন্ড ইয়েট্স ইত্যাদির। তারপর সাহিত্যগোষ্ঠী এসেছে র াজনীতির দুর্বার প্রভাবে ; যুদ্ধের বিপর্যয় ও জয়ের গৌরব, নতুন চিনের আবির্ভাব এবং আমাদের দেশে ১৯৪৭ - এর মনিববদলের ফলে শ, ফরাসি, তুর্কি, চিলির কবিদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। তাঁদের বিস্তার ও মানবিকতা যে আমাদের লেখায় ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক এবং সুখের বিষয়। কিন্তু তাঁদের সহজ মানবিকতার পিছনে যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, যে যন্ত্রণার পোড় খেয়ে লোকে নতুন উপলব্ধির পাহাড়-চূড়ায় আসতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও অনেকটা ধরা করা, বই পড়া ; দেশের মাটির, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বলতে গেলে সবেমাত্র শু হয়েছে...।' 'দেশের ঐতিহ্য' বলতে পাশ্চাত্য 'ট্র্যাডিশন'কে বোঝানো হচ্ছে, নিশ্চিতভাবেই সেই জ্ঞানমার্গীয় বোঝাটিকে বহন করতে চাননি পঞ্চাশের কবিরা, সেই বহন - বিদ্বেষ বা অস্বীকারের পেছনে নিশ্চিতভাবেই সমসাময়িকতার, দেশকাল সাপেক্ষতার কারণ লুকিয়ে আছে ; আর সেই কারণের জন্য ফিরে তাকাতে হবে পঞ্চাশের নিজস্ব যন্ত্রণার ইতিহাসে, যে ইতিহাস বরং কেতাবি শাসনের বাইরে নানা দ্বিধা - সংশয়ে পূর্ণ এক স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-ইতিহাস। এই ইতিহাসের দায় নেই মতাদর্শ অথবা বিদ্যায়তনিক নিয়মের শৃঙ্খলা রক্ষা করার। 'যা ধরা দেয় যেভাবে' (৩) এই উত্তর-ঔপনিবেশিক বহুত্ববাদী ভাবনার বীজতত্ত্বটি যেন আসলে লুকিয়ে থাকে পঞ্চাশের করিতায়। 'ঐতিহ্য' মিথ্যা হলেও, 'মাটি' মিথ্যা হয় না ; বরং 'বই পড়া' মিথ্যা হয় কিন্তু 'অভিজ্ঞতা' ধার করা হয় না। 'ঐতিহ্য' আর 'বই পড়া'-- কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে দিয়ে নবচেতনাকে যে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চিতভাবেই 'মাটি' ও 'অভিজ্ঞতা' নামক শব্দদুটি, য ার সাক্ষ্য দিতে আসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'অভিজ্ঞতায় নেই এমন কিছু কখনই লিখি না, লেখা উচিত বলেও মনে করি ন

া।(৪) অতএব অভিজ্ঞতার পৃথিবী, যার সঙ্গে গড়ে ওঠে অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক' 'স্বীকারোক্তিমূলক' কবিতার গাঁটছড়া আর সেই 'আন্-অরগানিইজড্ পলিটিক'-এর বিগত পঁচিশ বছর, রণজিৎ গুহ কথিত 'পঞ্চাশের বিশৃঙ্খল রাজনীতির প্রেক্ষাপট।' (৫) দেশ ও বিদেশের নিরিখে ওই ক্ষণভঙ্গুরতারলক্ষণগুলি যেভাবে অদল-বদল হচ্ছিল, সদর-মফস্বল হচ্ছিল, তাতে যে আর কোনো উন্নয়নের পঞ্চাশের দশকীয় তত্ত্ব নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারে না তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। যতই জওহরলাল নেহর অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে লেখা চিঠিগুলি উত্তম মঙ্গলম্ সম্পাদনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা কন যে সম াজতান্ত্রিক নেহর চেয়ে জনগণতান্ত্রিক পরিচয় অনেক বেশি প্রকট ছিল, তবুও একথা ভোলা যায় না, তাঁর রচিত পঞ্চবা র্ষিকী পরিকল্পনাগুলির প্রত্যেকটির পরিকল্পনা ও পরিসমাপ্তির মধ্যে আসলে লুকিয়ে ছিল ব্যক্তিগত ইমেজের ঝোঁক, যা জনগণতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং ক্ষণভঙ্গুরতার, বিশৃঙ্খলার রাজনীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি-কেই প্রকট করে তোলে। আর একথা সাতকাহন করে জানিয়েও ছিলেন আটের দশকের গবেষণায় বিনায়ক পট্টনায়ক। (৬) তাহলে, পঞ্চাশের দশকের কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার আগে সেই পঁচিশ বছরের দেশ - বিদেশের রাজনীতির ওই ঝোঁকগুলি কাল ানুক্রমিকতায় ফিরে দেখা দরকার, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের তত্ত্ববিটি।

২

১৯২৫ থেকে ১৯৫০ -- খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই পঁচিশ বছর বাঙালির জীবনযাত্রায় এবং মানসিকতায় নানা পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি পরস্পর বিপরীত ঘটনার উদ্ভব ঘটে-- সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অগ্রগতি আর ফ্যাসিস্টশক্তির উত্থান। ইতিহাসের দুটি সমান্তরাল দ্বান্দ্বিক-সত্য, শক্তি-দ্বন্দ্ব বা আধুনিক শক্তি-রাজনীতির ভারসাম্য- বিনিময়ের পরিচয় নিশ্চিতভাবেই বাঙালির জীবনেও গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে--- অ্যাকাডেমিক স্তরথেকে চায়ের দোক ানের স্তর পর্যন্ত। এদেশে বামপন্থী রাজনীতির সেই উদ্ভবের কালে আসলে এই দুই আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ঝোঁক গভীরভাবে ছড়িয়ে ছিল ; যারই অঙ্গ হয়ে ওঠে কফিহাউসের আড্ডাগুলি, রেস্টুরেন্টের অফিস - ফেরত সন্ধ্যার গুলতানি, সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতিগুর বাড়ি বৈঠকখানার ঠেকবাজি অথবা নিশ্চিতভাবেই 'অতি আাদিত খ ালাসি-টোলা'র (৭) মত মদের আড্ডার নানা মিথাকর্ষণ। এই বৃত্তমুখী বাঙালির বিশ্চর্চায়বাঁধন ছেঁড়ার কাজ যেমন চলেছে, বাঁধন শক্ত করার কাজও কম হয়নি। একটি আধা- সামন্ততান্ত্রিক দেশে আধুনিকতার বিশ্ব-ঝোঁকগুলি যখন প্রভাব বিস্তার করে তখন সম্ভবত এভাবেই তার অন্দর - বাহিরের টানাপোড়েন গুত্বপূর্ণ করে তোলে গোটা জাতিকে, জীবনকে। 'দ্বন্দ্ব' শব্দটির অর্থান্তর ঘটে -- দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে ; ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় তার 'ভাব' বদল হয়। এই ভাববদলের ঘটনাই নানা স্তরে স্বাধীনতার আগের তিন দশকে ঘটতে থাকে।একেশুধুমাত্র বামপন্থার গড়ে ওঠে ভাবলে ভুল হবে, কংগ্রেস থেকে শু করে নানা অ-কংগ্রেসি দলের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটঅথবা রাসায়নিক বদলের ঘটনাও এসময় সমানভ াবে গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'ঘর' থেকে আবার 'বাইরে' তাকানো যাক। ফ্যাসিস্ট ইতালি ১৯৩৬ সালে আফ্রিকার আবিসিনিয়া আক্রমণ করে; অন্যদিকে জাপান আক্রমণ করে 'মুক্তিসংগ্রামী' চিনকে। নাৎসিরা এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশেই ঢুকে পড়ে সামাজিক - রাজনৈতিক বদলপ্রক্রিয়ায়। এরই ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে যান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছিল, শুধু যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও পারমাণবিক বোমার ব্যবহার সেই বিকাশের ধবংসাত্মক, নস্তর্থক দিকগুলিকে প্রকট করে তোলে। শক্তি - রাজনীতির যে যান্ত্রিকতায় রূপান্তর ঘটতে পারে এভাবে, যা মানুষের নিজস্ব শক্তির প্রাকে তুচ্ছ করে দেয়, মিথ্যা করে দেয় ; তা ভাবতেই পারেনি রাষ্ট্রনায়করা, বিজ্ঞানীরা, এমনকী যুদ্ধে যুক্ত নানাস্তরের ক্ষমত াধর মানুষরাও। ফলে, ১৯৪৫-এ যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন 'বাঁচা' শব্দটির মৌলিক ও ধ্রুপদী অর্থ একদম বদলে যায়। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয় কবি, কবিতা, কবিত্ব প্রচলিত ঢঙ। থিওদের আদর্নোর কথা মনে পড়ে, 'দাহাউভিৎশের পর আর কবিতা হয় কি ?' প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উত্তর, লুকিয়ে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দর্শন-অবস্থান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে অস্থিতি, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা নিয়ে আসে, তার প্রভাব ছিল ব্রিটিশ কলোনি ভারতেও। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় (৮) 'আপেক্ষিকতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দটির সামাাজিক, দার্শনিক

ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ভুলে গেলে চলবে না। আর সেই তাৎপর্যেই বুঝতে হবে সমকালীন ঘটনাধারাকে--- ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ, ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস দলত্যাগ এবং মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। পরের বছরেই সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেন আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। ১৯৪২ -এ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দেশে ফিরে যাওয়া ; ভারত ছাড়ো আন্দোলন শু। ১৯৪৩-এ বাংলার মন্বন্তর, দেশের বাইরে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন। ১৯৪৫-এ সেই ফৌজের তিন নেতার বিচার এবং দেশজুড়ে তুমুল প্রতিক্রিয়া। বিশ্বযুদ্ধ থামে। ১৯৪৬-এ রশিদ আলি দিবস ও মুম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ, ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটন পরিকল্পনা ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। পাশাপাশি ছিল দেশভাগ, দাঙ্গা, রক্তক্ষয় এরং পরের বছর গান্ধিজির মৃত্যু। ভাবতে আশ্চর্য লাগে,' ৪৭-এর ওই ত্রান্তিকালটিকে বাঙালি সেভাবে সংস্কৃতি চর্চার প্রতিক্রিয়া রূপে গ্রহণ করেনি। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় না - হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই লেখা হতে থাকে, 'অবশেষে পাওয়া গেল স্বাধীনতা' (অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ১৩২), কিন্তু, বিপান চন্দ্রের মত মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকও লেখেন, '১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতবর্ষ মুক্তির প্রথম দিনটির আনন্দ উপভোগ করল। অসংখ্য দেশভক্তের আত্মত্যাগ, শহিদের আত্মবিসর্জন আজ সার্থক হল' (আধুনিক ভারত)। এই শহিদের 'সার্থকতা'র নিদর্শন যে 'মুক্তি', জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তাকে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি রূপে দেখেছেন, সেই পরিতৃপ্তিরই অন্য পিঠ যেন এই 'মুক্তি'। তারপর বিপান চন্দ্র লিখেছেন, '...আনন্দের সঙ্গে মিশে ছিল বেদনা আর দুঃখ।... স্বাধীনতার সেই মুহূর্তটিতেই ভারত আর' পাকিস্তানে বয়ে চলেছিল সাম্প্রদায়িক মত্ততার প্রবাহ, অবর্ণনীয় বীভৎসতায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল হাজার হাজার মানুষের জীবন' (আধুনিক ভারত, পৃ. ৩০৬)। এই উদ্ধৃতির অংশ দুটি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে দেশভাগ ও স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদী আদিকল্পটি কতটা বিশাল আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে অন্যতর ভাবনাবৃত্তকেও। শিল্পের নানা মাধ্যম সম্পর্কেও এই ভাবনা-আগ্রাসনের রূপটি সত্য অথচ বাঙালির শিল্পচর্চায় মন্বন্তর যতটা স্থান গ্রহণ করেছে, দেশভাগ ও দাঙ্গা ততটা করতে পারেনি। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে লিখেছেন, 'উত্তর ভ ারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ ঘটনাই হয়তো দেশভ াগ।... দেশভাগের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনোভাবেই কেন্দ্রিয় বিষয় হয়ে দেখা দেয়নি' (ভ গ্নাংশের সমর্থনে দাঙ্গা নিয়ে কি লেখা যায়?, পৃ. ২৬৩) (৯)। যে অস্থিতির ছবি সামাজিকভাবে তৈরি হয়েছিল, তার ভ াবগত প্রতিক্রিয়া মানসিক স্তরে নানাভাবে হলেও পঞ্চাশের কবিতা প্রসঙ্গেও একথা সত্য যে সরাসরি তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া বহু দেশভাগ ক্ষতিগ্রস্ত কবিদের কবিতাতেও দেখা যায়নি। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় তপতী চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত করেছেন, '১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যেভাবে বাঙালি সাহিত্যিককে নাড়া দিয়েছিল, ১৯৪৭-এর দেশভাগ গোটা সমাজকে ওলটপালট করে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মোটেই ১৯৫০-এর দশক বা তার পরবর্তীকালের সাহিত্যে সেভাবে রেখাপাত করেনি' (দ্যফিডম স্ট্রাগল অ্যান্ড বেঙ্গলি লিটারেচার অফ দ্য ১৯৪০, পৃ. ৩২৯)

১৯৫০-এ সংবিধান প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে জওহরলাল-কৃত একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আধারে যাত্রা করা সত্তেবও ভারতের সমানে ছিল আসলে সমস্যার পাহাড়, যেগুলো লক্ষ করেছিলেন পঞ্চাশের কবিরা। কালোবাজারি, ক ালো টাকার অর্থনীতি শু হল, যা আসলে মন্বন্তর ও দেশভাগের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত বাঙালি জীবনে। পল গ্রিনো যেভাবে দেখিয়েছিলেন, এটা এক ধরনের চক্রবৎ অর্থনৈতিক অপরাধের সৃষ্টি করে (১০)। গ্রামীণ অর্থনীতি নষ্ট হয়। শহরমুখী হয় মানুষ। যদিও উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মধ্যে এই শহরমুখী প্রবণতার বীজঅনেক আগে থেকে লুকিয়ে ছিল। শিক্ষিত তণরা পড়তে আসতো শহরে। শহরের আধুনিক সুবিধার মোহ, কখনও শহর ও শহরতলিতে চ াকরি করার সুযোগ। তখন অন্তত দুটো শহর ছিল --- কলকাতা ও ঢাকা। স্বাধীনতার পর কলকাতাই হয়ে ওঠে বাঙা লিদের উদ্বাস্তু-নগর, আবার শিক্ষা - সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এত চাপ নেওয়ার মত ক্ষমতা কলকাতার ছিল না। ফলে, বাঙা লি জীবনের গ্রাম ছুঁয়ে থাকার সমস্ত সম্ভাবনাকে লুপ্ত করে কলকাতা- কেন্দ্রিক বাঙালিরা, কিংবা কলকাতামুখী নাগরিক ব াঙালিরা দাণ সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ভাঙা এক রূপান্তরিত জীবনচর্যার পরিচয় তুলে ধরেছিল। পঞ্চাশের কবিতায় এর নির্যাসকে খুঁজে পাওয়া যায়, কবিতার অন্তর্গত বিষয়কে বিচার করলে, ব্যাখ্যা করলে।

'দু জোড়া লাথির ঘায়ে মেঝেতে লুটায় রবীন্দ্র রচনাবলী' সুনীলের এই পংক্তি থেকেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ভাঙার উদাহরণ কিংবা রূপান্তরিত মনোভাবের পরিচয়। সুনীল যখন প্রেমের কথা বলেন তখনও সেই পরিচিত রোমান্টিকতাকে আক্রমণ করেন, 'অন্ধতি হাঁ কর, আলজিভ চুমু খাব।' যদি পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতার দিকে দেখা যায়, তাহলে, প্রেমের জীবনানুগ বহু ছবি পাওয়া যাবে, পরস্পর বেঁচে থাকার বহু প্রতিশ্রুতি ; তবু সর্বাত্মক সম্পর্কের দিকে তাকিয়েই তো সেই পূর্ণেন্দুই বলেন, 'সোনার কলসী ভেঙে যায় উজ্জ্বল সিঁড়িতে।' যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'আমি সোনার মাছি খুন করেছি'-র অ্যান্টি রোমান্টিকতার পাশে আত্মতার প্রতিষ্ঠা চিনিয়ে দেয় আত্ম - অনুসন্ধানী সময়কে, 'দূরে ভেসে যায় শব, কোথা ছিল বাড়ি ?/ রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়, 'আমি স্বেচ্ছাচারী।' অথবা পঞ্চাশের সবচেয়ে লোক - ধ্রুপদী কবি বিনয় মজুমদার, যিনি প্রেমিকাকে 'ঈশ্বরী' বলেন, বলেন ভারতীয় দর্শন সংযুক্ত ভাবনায় 'ফিরে এসো চাকা', আবার 'চাকা' শব্দের অ্যান্টি-রোমান্টিক প্রয়োগটিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মনে রাখতে হয় তিনি লিখেছেন, 'বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,/ যেহেতু সকলে জানে তার শাদা পালকের নীচে/ রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ।'

শিবশম্ভু পাল সৌন্দর্য, শিল্পবোধের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রয়োজনের দিকটি যখন উল্লেখ করেন তখন কিন্তু সেই সময়বাদী চ্যালেঞ্জটিকেই ছুঁড়ে দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠিত নন্দনতত্ত্বের দিকে, 'যে যার নিজস্ব ঘরে পেলমেট বসাক, পর্দার / সৌজন্যশিল্পের দায়ে আড়ালের খসড়া রচে নিক/রাত্রে যেন খিল আঁটতে ভুল হয় না।' অমিতাভ দাশগুপ্ত আবার সরাসরি রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বলতে থাকেন সমসাময়িক মানুষের কথা, নিষ্ক্রিয়তার কথা, 'কাঠের চেয়ারেবসে থাকতে থাকতে/মানুষও একদিন কাঠ হয়ে যায়।' পাশাপাশি পড়া যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং ব্যক্তিগত শোককীভাবে সময়ের অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়ে যায় তার পরিচয় পাওয়া যায়, 'হে সময়! হে পশ্চাদ্ধাবনরত স্মৃতিহীনশোক / তুমি কি কখনো আর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকার ফিরিয়ে নেবে না' অন্ধকারের সূত্র ধরেই চলে যাওয়া রাতের কথা, যেখানে উৎপলকুমার বসু সেই আত্ম-অনুসন্ধানের কথা শোনান, শোনান সময়ের কথাই, 'বোবা ও বধির আমি, এই রাত্রির মতো, ঐ বাদুড়ের মতো, ঐ কামঠের মতো আমি। গতিময় অথচ নিশ্চল'। এই পরস্পর বিপরীত অবস্থানথেকেই দিব্যেন্দু পালিত লেখেন, 'পর পর ঘুম আসে। ঘুম, নাকি মৃত্যুর কোরক !' যেমন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা জটিলতায়, কাব্যরচনার কারিকুরিতে বলেন,'ফুল সুরভির মতো ইচ্ছাসুখ অক্লেশে ছিঁড়েছ /কুচিকুচি করে দিনদুপহরে শরীর আমার।' আবার প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'কে যে কাকে নাচায় ? যায়, একটা জীবন পুরো বুঝে নিতে।' সেই জিজ্ঞাসার সূত্রেই একটি অনাদর্শচিত সমাধানও কি বুঝিয়ে দেয় না সেই মূল্যবোধ বিষয়ক সিদ্ধান্ত ছিল প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও, 'তুমি এত অহঙ্কারী কেন?/ কিছুটা মিথ্যের মায়া বরং মানাত ওই মুখে।' সেই জীবনের দিকে তাকিয়েই লেখেন সুধেন্দু মল্লিক, 'যখন দাঁড়াই এসে দর্পণের কাছে , প্রাগুলি ---/ জীবন কি খুব ব্যর্থ লাগে?' তারাপদ রায় লিখেছেন, 'আপনারা দেখা হলেই জানতে চান,'কি রকম?' আমি চমৎকার হেসে বলি, 'এর থেকে ভালো থাকার কথা ছিল না।' মতি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন রূপকের মধ্যে দিয়ে, 'সমস্ত রাত চাঁদ ছিল না, কেবল লোহা ছিল। লোহার থেকে চাঁদের মতো জ্যোৎস্না ঝরেছিল।'

এই সমস্ত উদ্ধৃতিকেই সময়ের দিকে থেকে দেখলে খুঁজে পাওয়া যায় সেই বিগত পঁচিশ বছরের রূপান্তরিত সমাজ ও মনের ছবি। পঞ্চাশের 'কৃত্তিবাস'-কে যদি এই ছবি তুলে ধরার কাজে একটা খুঁটি বিবেচনা করা যায়, তাহলে 'শতভিষা' নিশ্চিতভাবে অন্যরকম কাব্যাদর্শে আরেকটা খুঁটির কাজ করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পঞ্চাশের কবিরা এই দুই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই মূলত বিভক্ত হয়েছিলেন, কোনো 'কবিতা' বা 'দেশ' পত্রিকা নয়। এদের মধ্যে অনেকেই দুটি পত্রিকাতেই লিখেছেন, কিন্তু পড়লেই বোঝা যায় কার টান কোন দিকে। 'শতভিষা' সম্পাদক আলোক সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ উতল নির্জন বের হয় ১৯৫০ সালে। এই দশকে কবিদের মধ্যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সেই আলোক সরকার লিখেছেন, 'বাবা খুঁজতে বেরিয়েছে ছেলেকে / সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ / বাড়ি ফিরে আসেনি ছেলে।' আর সময়-সচেতন, কাব্যিক কাকার্যে দক্ষ মেধাবী কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'আমারই হাতে এত দিয়েছে সম্ভার / জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেব? / ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর / আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

আরেক উল্লেখযোগ্য কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যিনি অমিয় চক্রবর্তীর পর বাংলা কবিতার দ্বি-নাগরিক, অত্যন্ত সময় - দায়বদ্ধ, ডায়াসপোরিক কবি ; তিনি লিখেছেন, 'আমরা পান্থশালার বারান্দায় / বসব না। / সূর্য / অণ বসুর নিয়ে যখন / দিনান্ত ; / চন্দ্র / কিরণমালা নিয়ে যখন / নিভন্ত ;/ আমার/ পান্থশালার বারান্দায় / বসব না।' এরকম বহু উদ্ধৃতির কথা ভাবতে পারি আমরা, যার লক্ষ্য সেই সময় ও তার রাজনীতির টানাপোড়েন, তর্ক-বিতর্ককেই নির্দেশ করে। প্রেমের রাজনীতি, ক্ষোভের রাজনীতি, বর্ণের রাজনীতি, প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তির কিংবা শোষণের নানাতর রাজনীতি, যৌনতার র াজনীতি, একাকিত্বের রাজনীতি, স্বেচ্ছাচারের রাজনীতি অথবা রাজনীতির বিনির্মাণ, ---এসবই আসলে স্বাধীনতা - উত্তর ভারতের অবধারিত উত্তর- ঔপনিবেশিক লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে। চিনিয়ে দেয় ত্রম - আদর্শহীন সময়ের দিকে যাওয়ার টুকরো টুকরো পংক্তি। যেমন, 'এবার নষ্ট হব, আমায় দোষ দিও না' (শরৎকুমারমুখোপাধ্যায়) কিংবা 'আমি জানি না অ ামাকে কার সাথে লড়তে হবে' ---এই দুই লক্ষণের মধ্যে বসে থাকা ভবিষ্যৎযেন তাই প্রশ্ন তোলে, 'মুখোসের দেশে নেই জন্মনিয়ন্ত্রণবিধি পালনের কোনো প্রয়োজন?' (গৌরাঙ্গ ভৌমিক) আর এই প্রশ্ন নিশ্চিতভাবেই উত্তর-ঔপনিবেশিক র াজনৈতিক প্রশ্ন। একথা এভাবে বলতে চাইছি না যে মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী রাজনীতির বস্তুবাদী সর্বব্যাপ্ত ঝোঁক খুঁজতে চাইছি আমরা, বরং বলতে চাই, ওরকম এক জাতীয় নয়, বহুরকম--- বিচ্ছিন্ন, একক কিংবা দলবদ্ধ ভাবনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা খণ্ড খণ্ড রাজনীতিই আসলে দেশের পরিচয়, কবিতার পরিচয়।

পঞ্চাশের দশকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবিতা সিংহের লিখতে আসা। আজ যাকে 'নারীবাদ' বলা হয়, বাংলা কবিতায় তার সচেতন প্রথম প্রকাশ কবিতা সিংহের লেখায়। রাজলক্ষী দেবী, কনক মুখোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়দের লেখাকে মাথায় রেখেই একথা বলা যায়। হয়তো একথাও অত্যুক্তি হবে না, আশির দশকে যে মেয়েদের বহু পরিমাণে লিখতে আসতে দেখা যায়, তার লিঙ্গ - সচেতন সমর্থকও প্রথম কবিতা সিংহ। এর কারণটিও নিশ্চয়লুকিয়ে আছে সময়ের সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিক তাড়নার মধ্যে ; লিঙ্গভেদের সীমা লঙঘনের বাস্তবিক প্রয়োজনের মধ্যে, যখন 'ঘটি-বাঙাল' লড়াইয়ে 'অন্দর' লুপ্ত হয়ে যায়, 'বাহির' অবধারিত হয় শিক্ষা-চাকরি - বিয়ে - উত্তরাধিকারের নতুন প্রশ্নে। অবশ্য শুধু মেয়েদের দিক থেকে নয়, 'প্রতিষ্ঠি'র প্রয়োজনে এই জরি প্রসঙ্গগুলো ছেলেদের কাছেও গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পঞ্চাশের কবিদের অনেকেই অধ্যাপনা - শিক্ষকতা করেছেন আবার বিগত দশকের কবিদের চেয়ে অনেক বেশি সফল অর্থে সাংবাদিকতা করেছেন ; কারণ, প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রশ্নে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলির বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। পত্রিকাগুলির অনেকগুলিকেই প্রায় অধিকার করে নিয়েছেন পঞ্চাশের কবিরা। এই লক্ষণগুলি আসলে প্রমাণ করে রূপ ান্তরিত সময় ও তার রাজনীতির 'মহান' কোনো দায় না -থাকার বৈশিষ্ট্যকে, যা 'অলটারনেটিভ' এবং তাকে অধিকার করার রাজনীতি বলে চিহ্নিত করা যায়।

৪

এক দশক লেখার পর পঞ্চাশের কবিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পেছনে যখন ওই 'অলটারনেটিভ' আর তাকে অধিকার কর ার রাজনীতি গুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল , তখন ষাটের দশকের নতুন কবিদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এমন অলটারনেটিভের খোঁ াজ শু হয়ে গিয়েছিল। ষাট দশককে তাই অলটারনেটিভ খোঁজার দশক বলাই যায়। বলাই যায়, অলটারনেটিভের র াজনীতি অনুসন্ধানকাল। ১৯৬২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'দুই বসন্ত' নামে শঙ্খ ঘোষ একটি প্রবন্ধলিখেছিলেন, তার সূচন াংশ ছিল ওই অনুসন্ধানের অপেক্ষায় ইঙ্গিতময়, 'বিগত কয়েক বছর কবিরা যেন আবার একটি দুঃসাহসী অনুপ্রবেশ প্রস্তুত, ... অনভ্যস্ত এই প্রবেশের প্রথম অভিঘাত তাঁদের ঈষৎ বিভ্রান্ত করে দেবে এ হয়তো স্বাভাবিক, তবু তাঁদের দিশা হ ারানো আর দিশা নির্ণয়ের প্রবল পদক্ষেপগুলি এক নতুন আয়োজন সৃষ্টি করেছে আধুনিক কবিতায়।'

এই 'দুঃসাহসী অনুপ্রবেশ'--এর ইঙ্গিতটি কী অনুমান করা অসুবিধা হয় না, যেহেতু হাংরি বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ -র নভেম্বর - ডিসেম্বর আর পরের বছর এপ্রিলে বের হয়েছে 'হাংরি জেনারেশন'। পরিকল্পক মলয় রায়চৌধুরী। সঙ্গে দেবী রায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চাশের অন্য তিন কবি বিনয় মজুমদার, সমীর রায়চৌধুরী ও উৎপলকুমার বসুও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শোনা যায় 'কৃত্তিবাস'-এর চাপা ক্ষমতার দ্বন্দ্বই এভাবে হাংরির কাছাকাছি এনেছিল পঞ্চাশের

কবিদের। ইতিমধ্যে আমেরিকার 'বিটনিক' আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ কলকাতায় এলেন। 'হ াউল'-এর দৌলতে তিনি সারা পৃথিবীর কবিতানুরাগী মানুষদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। হাইডেগার-সার্ত্রের দর্শন অনুয ায়ী এঁরা জগতকে ভাবতেন 'কেঅস' রূপে এবং অতীত-ভবিষ্যৎহীন প্রত্যক্ষ-মুহূর্তের বাঁচাকে মূল্য দিয়ে এক বিক্ষত সময়ের সমস্ত প্রথা ও মূল্যবোধকে আক্রমণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ধবংসের জগত। যে কোনো চূড়ান্ততায় এঁদের আস্থা, যা বিপন্ন করে পরিচিত জীবন ও সৃষ্টিকে। 'দৈনিক কবিতা' গিনস্‌বার্গ প্রসঙ্গে লিখেছিল, 'অতি-আধুনিক কবিদের একাংশ এঁর দ্বারা প্রায় সম্মোহিত হয়েছিলেন।' তাঁরা অবশ্যই 'কৃত্তিবাস' ও 'হাংরি' গোষ্ঠীর কবিরা। যদিও সুনীল গঙ্গোপ াধ্যায় সবসময় হাংরির বিরোধিতা করেছেন এবং সেই বিরোধিতা কখনও কখনও বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে প্রায় শাসানির পর্যায়ে ছিল (১১)। আবার হাংরিদের পক্ষে আদালতে সাক্ষী দিয়ে আসেন তিনি। এইসব সূত্রেই মনে হয়, ব্যক্তিত্বের সংঘ াত বাদ দিলে 'কৃত্তিবাস' ও 'হাংরি' -র কবিরা নানাভাবে একাত্ম হতে পারতেন।

হাংরি বাংলা কবিতায় প্রথম সংগঠিত আন্দোলন। এঁদের ইস্তাহার (১২) পড়লেই বোঝা যাবে কাব্যাদর্শ ঠিক কী ছিল

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the art to be nothing but a 'thing' with a view to testing whether it is living or lifeless.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. The break looses the traditional association of words and the coin unconventional and here-to-force unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its Original forms.
12. To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the massage of the restless existence and the sense of disgust in a razor sharp language.
14. Personal ultimatum.

সমস্ত রকম বন্দিত্বের বিদ্ধে আত্মার মুক্তি ঘটাতে যাবতীয় সমাজিক ও সাহিত্যিক সংস্কার ভেঙে হাংরিরা তাঁদের 'জেব্রা', 'জিরাফ', 'ক্ষুধার্ত' ইত্যাদি পত্রিকায় নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। শৈল্পের ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবিমল বসাক, ফ াল্গুনী রায়, অরণি বসু, ত্রিদিব মিত্র, সুবো আচার্যরা পাঠাভ্যাসে ধাক্কা দেওয়া লেখালিখি করেছেন। নিশ্চয় এঁদের লেখা লিখির মধ্যে ইউরো - কেন্দ্রিকতা ছিল ; কিন্তু স্বাধীনতা- উত্তর ভারতের যে অলটারনেটিভের খোঁজ, তার সোচচার পরিচয় পাওয়া যায় হাংরিদের লেখালিখিতেও।

১৯৬৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর হাংরিদের কার্যকলাপ - এর বিদ্ধে অভিযোগ তুলে কলকাতা থেকে শৈল্পের ঘোষ আর সুভ াষ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুদিন বাদে পাটনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মলয়কে চারদিন পর ত্রিপুরা থেকে প্রদীপ চৌধুরীকে। মলয়ের নামে অ্লীল কবিতা লেখার জন্য মামলা শু হয়। ভাবতে অবাক লাগে, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নামে যে কবিতাটির জন্য মামলা হয়, সেটি একটি গতি, যৌনতা, প্রেম, ক্ষোভ আর মূল্যবোধকে আক্রমণ করা আশর্চ্য নিরীক্ষাধর্মী লেখা (১৩)। এমন লেখা বাংলা ভাষায় দুর্লভ, বিশেষত, 'অঘ্রাণের অননুভূতিমালা' ইত্যাদি রচনার অলটারনেটিভ র ূপে এই ধাক্কা, তুলনামূলকভাবে বাঙালি পাঠকদের মেনে নেওয়া বেশ কঠিন ছিল। রেনেসাঁর 'আলো' দগদগে বাঙালি

বুদ্ধিজীবীদের মগজে তখনও 'প্রাইভেট' আর 'পাবলিকে'র কাব্যতত্ত্ব অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেখানে 'ছায়া' ফেলে এমন কোনো বয়ান, তণদের দিক থেকে, প্রতিষ্ঠিত সংঘ-আত্রমনকারীদের দিক থেকে প্রবীণদের পক্ষে মেনে নেওয়াটা মুশকিলের ছিল। এই স্ববিরোধিতাটা বাঙালির মজ্জাগত, সে বাইরে বলে 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা', এদিকে অমূল্যদের সবচেয়ে আগে মেরে দেয়। প্রতিষ্ঠানের এই জাতীয় বয়ান নিজের সাপেক্ষে তৈরি করা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার চাতুরি প্রত্যেকটাসভা-সমিতি, পুরস্কার, সম্বর্ধনার কর্মকাণ্ড বিচার করলেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা পড়বে মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব, মাস - সাইকোলজির কলোনিয়াল লোভ ও অবিশ্বাস। তাই অলটারনেটিভ। কিন্তু অক্সিজেন পায়নি হাংরিরা। হ্যাঁ, 'টাইম' ম্যাগাজিনে তাদের নিয়ে লেখা হলেও, এবং সেটাই ছিল পৃথিবীব্যাপী প্রচারে 'টাইম'(১৪) পত্রিকার বাংলা কবিতা বিষয়ে প্রথম ও এ পর্যন্ত শেষ সংবাদ - পর্যালোচনা।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় 'শ্রুতি' পত্রিকা, যা জন্ম দেয় শ্রুতি আন্দোলনের। প্রবক্তা পুষ্কর দাশগুপ্ত। অন্যান্য কবিরা হলেন, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনলাল ধর, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমাজচেতনা ও রাজনীতির কূটকচালিকে বর্জন করে এরা শব্দচর্চা ও ব্যক্তি অনুভবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। লক্ষ্য ছিল, কবিতাকে কখনও মুদ্রণ বিন্যাসের সাহচর্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি, ছেদচিহ্নের বিলোপ, ব্যাকরণ বিরোধিতা, ছন্দ বিরোধিতা, মুখের ভাষার কাছাকাছি অথচ জটিল উপলব্ধির আবহ তৈরি করা। পরেশ মণ্ডল, অশোক চট্টোপাধ্যায়রা নিজেদের কিছু কিছু কবিতাকে তাই 'ছবিতা' বলেছেন। সুধু এই দুটি নয়. আরওদুটি কবিতা আন্দোলন ষাট দশকে হয়েছিল--- ধবংসকালীন ও প্রকল্পনা সর্বাঙ্গীণ কবিতা আন্দোলন। যে কোনো আন্দোলনের মতই এগুলির কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কবিরাই সরে গেছেন অন্যান্য ভাবনায় ; তবু 'অলটারনেটিভ' খোঁজার যে চেষ্টা ষাটের কবিতায় ছিল, তার প্রধান দৃষ্টান্ত অবশ্যই এই আন্দোলনগুলি। হয়তো কেউ কেউ এগুলির সঙ্গে সারা পৃথিবীব্যাপী যে অলটানেটিভ ছাত্র নারী যুদ্ধ, পরিবেশ, নাটক সিনেমা, গান, চিত্রকলার আন্দোলন হচ্ছিল, সেগুলির মিল খুঁজে পাবেন অথবা সম্প্রসারণ রূপে দেখবেন ; আমরা বলতে চাই, এই অলটারনেটিভের কোঁজ এদেশের প্রেক্ষিতেও সমান সত্য ছিল।

'ষাটের কবিগোষ্ঠী সত্যিই দলহীনদের একটা দল। তাঁদের চরিত্রের কোনো সামগ্রিক রূপ বা কবিতার মূল সুর খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা।' (১৫) মণীন্দ্র গুপ্তর এই মন্তব্যের যথার্থতা রয়েছে ওইসব আন্দোলনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কবিদের মধ্যে। তাঁরাও এক বিরাট অংশ, কিন্তু পঞ্চাশের কবিদের আধিপত্যের বাইরে অনেক সময় খ্যাতিহীন, কমআলোচিত ও অস্পষ্ট। অথচ তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট ক্ষমতাবান, গুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। যেমন, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দার্শনিকতার এক গভীর অথচ নাটকীয় উপস্থাপনা তাঁর কবিতায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে' যাওয়ার চেষ্টায় যে 'ইবলিশের আত্মদর্শন' গড়ে তোলেন, তাতে ধরা পড়ে বাংলা দীর্ঘকবিতা চর্চার উল্লেখযোগ্য বাঁকবদল। একদা তাঁকে কেন্দ্র করে একটি কবিতা-চর্চাবৃত্ত তৈরি হয়েছিল, 'কবিপত্র' যার অন্যতম প্রকাশবিন্দু। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দার্শনিকতার চর্চা বা কবিতায় দর্শনের সচেতন ব্যবহার ষাটের একাধিক কবিদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। 'গভীর অর্থে কোনো কিছুই চিরায়ত নয় / না সত্যেরা না মিথ্যারা ---/ এমন কি ব্রহ্মের বোধ, লোকায়ত ধ্যান। / গভীর অর্থে কোনো মানুষ / সুখেও নেই, দুঃখেও নেই'--- রত্নের হাজরার এই পংক্তিই বলে দেয় নরপৃথিবীর বোধ কতটা দার্শনিক হয়েও কাব্যিক। সেই দার্শনিকতারই যেন উল্টো পিঠ কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতা, 'আমাদের মহাভারত পড়া শেষ হয়নি আজও। / একদিন আমি আমার জরাগ্রস্ত পিতামহকে মহাভারত পড়তে দেখেছি/ আজ আমার বালক পুত্রকে মহাভরত পড়তে দেখলাম।' আপাত তুচ্ছকে 'অনুভূতিদেশের আলো দিয়ে কবিতা করে তোলার খেয়াল, তত্ত্বায়নে যে ভারতীয়' 'অস্তিবাদী' ভাবনার সমর্থন থাকে তাঁর কবিতায়, তাতে নিশ্চিতভাবেই ষাটের অন্যতম প্রধান কবি কালীকৃষ্ণ গুহর সূত্র ধরে একটি সময় - দর্শনের খোঁজ পাই আমরা। এই পথেই আরও যাঁরা অন্তর্মুখী দর্শনপ্রবণ কবিতা রচনা করে গেছেন, তাঁদের অন্যতম সামসুল হক, মৃণাল দত্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। মরমী সেই ভাবনালোক থেকেই তুলসী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রতিভায় প্রতিভায় ছেয়ে আছে দশদিক/দশদিকে আকাশচারী উজ্জ্বল নক্ষত্র / আমার একটা ভালো মানুষ চাই /' অথবা নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 'শুধুএকটাই শর্ত/ একটাই শর্তে/ তার কাছে যাওয়া যায়/ তার কাছে যেতে হয়/ তার কাছে যাই/ তা হলে

/ আমি বেঁচে আছি।' কিংবা, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত লেখেন, 'দেয়াল তাকিয়ে থাকে দেয়ালের দিকে/ একাকিত্ব/ একাকিত্বের দিকে...।'

সুচেতা মিত্র, প্রতিমা রায়, দেবারতি মিত্র, কেতকী কুশারী ডাইসন, বিজয়া মুখোপাধ্যায় ও গীতা চট্টোপাধ্যায় -- ষাটের ছয় মহিলা কবি, যাঁদের লেখায় কোনো আপাত ঐক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিজেরকথা বলার মধ্যে দিয়ে যে মেয়েদের কথা বলার জগৎ গড়ে তোলা, তার নানা উদাহরণ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে ব্যক্তিগত ভাষা-পৃথিবীর খোঁজ। হয়তো এঁদের অনেকের মধ্যেই লেখালিখির শুতে খানিকটা চাপানো জটিলতা ছিল, আত্মপ্রকাশের দম্ভ ছিল না বলে 'অপ্রকাশকে'বড় করে ভাবার মত 'ভক্তিমার্গীয়' টান ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালেএরাই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়ে স্পষ্টবাক্, নারীবাদী, ডায়াসপোরিক, অথেনটিক ও বহির্মুখী। লক্ষ করলে দেখা যাবে ষাটের মহিলা কবিদের মধ্যেই অন্যান্য দশকের মহিলা কবিদের চেয়ে অনেক বেশি বদল-প্রক্রিয়ার চিহ্।

ভীষণভাবে আত্মজৈবনিক, সৌন্দর্য উপাসক নন এবং গদ্যধর্মী উচচারণে জীবনের উল্টোপিঠটাকে নানাভাবে দেখানোর মধ্যে দিয়ে যে কঠিন অভ্যেসটিকে তুলে ধরেছিলেন আরেক দল ষাটের কবি, তাঁর হলেন ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপ াধ্যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউসচেতন বা অসচেতনভাবে অ্যান্টিপোয়েট্রি লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়(১৬)। যেমন, বুদ্ধদেব, মানিক, ভাস্কর। অপ্রাণকে প্রাণসম্পন্ন করে, জীবনের তথাকথিত অসুন্দরকে নানা প্রসঙ্গে আকস্মিক টেনে এনে যে বিরোধাভাস তৈরি করা যায়, বুদ্ধদেব যেন সেখান থেকেই লেখেন, 'বেঁচে আছ কিনা জানার জন্য / পেচছাপ করো হাতের ওপর' কিংবা শামসের, 'আমি যখন চায়ের কাপে চুমুক দিই, হঠাৎ চায়ের কাপ ভেঙে/ রক্তাক্ত বাটি হয়ে যায়' আর শেষতম ভাস্কর, 'ওগো কাঠের বাক্সে ঢাকা হারমোনিয়ম, তুমি গান গাইতে থাকোআমাদের।' জীবনের শাসনে ঢাকা পড়ে যাওয়া বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি, প্রেম, ক্ষোভ, মনখারাপ, দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়াকে বাঁকাভাবে দেখার মধ্যে, বিদ্রূপ করার মধ্যে, হেসে ওঠার মধ্যেই রয়ে গেছে ষাটের একটা অগীতল, স্পষ্টবাক্, নির্মেদ, গদ্যধর্মী কাব্যধারা। যদি এই 'বাঁকা' ভাবে দেখার বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা 'অলটারনেটিভ'--এর সমান্তরালে দেখি তাহলে কিন্তু 'গীতিময়' বাংলা কবিতাধারার পাশে এক ধরনের অপ্রতিষ্ঠানিক ঝোঁক, ভোলবদলের উদ্যোগ বা সময় - স্পর্শী রূপ খুঁজে পাই। নিশ্চিতভাবেই তা ব্যক্তিক গণ্ডীতে আটকে থাকে অথবা সমষ্টি - চেতনার দিকেযেতে রাজি হয় না। অনেশ ঘোষ লিখেছেন আমরা আরম্ভেই পরিত্যক্ত। প্রসূতি ও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে যেতে থাকি পৃথিবীর বিদেশি রাস্তায়।

ষাটের কবিতায় যে সময়-সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ছিল, ব্যক্তিকবোধের সমষ্টিগত বোধে যাওয়ায় নানা দ্বিধা-সংশয় ছিল, তার নিন্দা ঘুচিয়েছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য, রবীন সুর, শম্ভু রক্ষিত সাগর চক্রবর্তী, কমলেশ সেন। বামপন্থী অ ান্দোলন ঘিরে তাত্ত্বিক বিতর্ক এবং পার্টির ভেঙে যাওয়া, প্রাকটিশের নানা রূপ বদল ঘটছিল, আর তারই চূড়ান্ত বিস্ফে ারণ ঘটে সত্তর দশকে, সত্তরের কবিতায় ; যার জমি তৈরির ছবি পাওয়া যাবে এঁদের কবিতায়। বিশেষত ঘাটের শেয়ার্ধে রচিত কবিতায়, যার অন্যতম ভিত্তি সমাজ ও মানুষকে ঘিরে এমন একটা স্বপ্নের ঘোর তৈরি করা যাতে পার্টিগত বিবাদের চূড়ান্ততাবাদী ঝোঁক ও রাজনীতির লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। চেনা যায় তার সমাজ - রাজনৈতিকঅবস্থান। কারণ , দেওয়ালে তখন রক্তলিখন কে কোন্ দিকে চিনে নেওয়ার সময় এখন। সময় এখন জেনে নেওয়ার তুমি কোন্ দলে--- (সরোজ দত্ত)

১৯৬০-এর ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে এই দশক শু হয়েছিল, শু হয়েছিল ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে ; তারপর চিন-ভ ারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্টপার্টি দুভাগ হয়ে গেল, সি পি আই আর সি পি আই (এম)।১৯৬৬ -তে খাদ্য আন্দোলন --- গুলি, লাঠিচার্জ, বন্ধ, আন্দোলনে মুখর পশ্চিমবঙ্গ। ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস তৈরি হল এবং জন্ম হল ৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকারের। অন্যদিকে নকশালবাড়ির তরাই অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের শু। পিকিং রেডিও এই ঘটনাকে ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম হিসাবে ঘোষণা করে। তৈরি হল সিপি আই (এম এল) দল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে, ১৯৬৮ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় দমন-

পীড়ন, অত্যাচার। নির্বাচন বয়কট, ছোট ছোট স্বাধীন অঞ্চল ঘোষণা, জোতদার জমিদার খতমের মধ্যে দিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ চলেছে। বাইরে লড়ছে ভিয়েতনাম, চিনের সাংস্কৃতির বিপ্লব, চে গুয়েভারাতরে মৃত্যু (১৯৬৭), মার্টিন লুথার কিং (১৯৬৮) এবং হো-চি-মিনের (১৯৬৯) মৃত্যু সংবাদের মধ্যে নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে পৌছেছেন, ২১ জুলাই ১৯৬৯।

যদিও সম্প্রতি এই ঘটনাটি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নাসার ওই প্রকল্পেরই একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, এটি আমেরিকান সরক ারের একটা বড় ধাপ্পা। হাওয়াহীন চাঁদের বুকে আমেরিকার পতাকা পত্পত করে উড়ছে --- এমন সতেরো দফা প্রমাণ দিয়ে তিনি বলেছেন, চাঁদে নামার ঘটনাটি 'এরিয়া-৫১' এলাকার শ্যুটিং করা, যেখানে হলিউডের এই ধরনের ভিন্গ্রহ-সংক্রান্ত ছবির শ্যুটিং হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানটি 'ফক্স টিভি' একাধিকবার সারা বিশ্ব সম্প্রচার করেছে। এসবই আসলে নানা র াজনৈতিক শক্তির শক্তিপ্রদর্শন, আদান - প্রদান ও ঝিরাজনীতিতে অবস্থান নির্ণয়ের আয়োজন; আরো নির্দিষ্ট করে বলা য ায়, বামপন্থী রাজনীতির নিজস্ব জমি অর্জনের এমন কিছু চেষ্টা যার মধ্যে ধরা পড়েছিলঔপনিবেশিক এশিয়ার মার্ক্সবাদী প্রয়োগতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ও পথ নির্ণয়ের শেষ বৃহত্তম উদ্যোগ। সবচেয়ে বড়ভাবে খতিয়ে দেখার, বিকল্প খোঁজার বা অলটারনেটিভের সন্ধান। ষাটের কবিতার যে শেষতম অংশটির শিয়রে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তাকে বিচার করতে এই স ামাজিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখতেই হবে।

মণিভূষণ লিখেছিলেন, 'কী সব যেন বলেছিলাম ভুলে গেছি। / ভুলে গেছি তুমুল বাতাস ক্ষিপ্ত করে / বরেণ্য ঐ ঘাড়ের উপর / চুলে যে অরণ্য ছিল / ভুলে গেছি, এখন শুধু মনে পড়ে / হাজার হাজার লাশ ঠাণ্ডা ঘরে।' রাজনৈতিককবিতার যে কাহিনিধর্মিতা, যে স্পষ্টবাচন, তাকে স্থির লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করে উচচারণ করতে পারার কঠিন কাজটি পৃথিবীর বহু ব্যর্থ রাজনৈতিক কবিদের মত না - ধেড়িয়ে সফলভাবে করতে পেরেছেন বাংলাভাষার যে কয়েকজন, মণিভূষণ তার মধ্যে অন্যতম। সেই একই রাজনৈতিক আবহে থেকে দেবদাস আচার্য কিন্তু শুধু রাজনৈতিক কবিতা লেখেননি, বরং বৃত্তটাকে বা ড়িয়ে নিয়েছেন, যেখানে ধরা পড়েছে এদেশের হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের বঞ্চনার কথা, দাঁত চেপে বেঁচে থাকার কথা। তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে ষাট দশকে র রাজনৈতিক আত্মা, যে আত্মা ক্ষুধায় পীড়িত, যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান, 'আমার ছে াট্ট আর মিষ্টি মা টি ভাজেন/ এবং তাকিয়ে থাকেন বাবার সেলাই কলের দিকে / এবং আমরা সবাই চুপচাপ তাঁকে ঘিরে বসে থাকি / যেন কোনো একটা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছেআমাদের।' একই রকম সত্য শম্ভু রক্ষিত কিংবা রবীন সুরের কবিতা। সত্তরের দশকে জরি অবস্থায় সময় শম্ভু রক্ষিত জেলে যান এবং জেল থেকে বেরিয়ে যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন, 'রাজনীতি', যার প্রচ্ছদে ছিল পিকাসোর ফ্যাসিস্ট বিরোধী ছবি আর গোপন প্রেসে রাতের অন্ধকারে ছাপা হয়েছিল সেই কবিতা ; তার তুল্য রাজনৈতিক কাব্যগ্রন্থ ইদানিংকালে বাংলাভাষায় বিরল। একদা জনপ্রিয় সে বইয়ের দুটি সংস্করণ পর্যন্ত হয়েছিল। আমাদের চেনা কাহিনিধর্মী, দলমত নির্দেশিত রাজনৈতিক কবিতা পাঠকের অভিজ্ঞতায় সেই কবিতার ভাষা, ভঙ্গি ও প্রতিপাদ্য অনেকটাই অন্য অভিজ্ঞতা।

৫

ষাট দশকের শেষ বছরে, ১৯৬৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর, অন্ধ্রের বিপ্লবী কবি সুববারাও পাণিগ্রাহি পুলিশের গুলিতে মারা যান। আর সত্তরর দশক শু হচ্ছে, ডিসেম্বরে মেদিনীপুরের কবি সুদেব চক্রবর্তীর খুনের মধ্যে দিয়ে। পরের বছর কবি দ্রোণ াচার্য ঘোষ হুগলী জেলে পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন। মারা গেলেন সরোজ দত্ত। বহু তণ কবি-লেখক জেলে। ১৯ নভে ম্বর বারাসাত, ব্যারাকপুরে রাস্তার উপর কয়েক মাইল জুড়ে ১১ জন তণকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। দেওয়ালে লেখা, 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত কন'। এই অঙ্গীকার বা নকশালবাড়ির আগুন কিংবা রাজনৈতিক ঘনঘটা যেন সত্তর দশকের বহমান ঘটনা, যেন প্রবহমান রাজনৈতিক 'ইভেন্ট'। ফলে সত্তর দশকের কবিদের মধ্যে বহু কবিই জীবনের শুতে এই রাজনৈতিক আবহের অংশে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। হয়তো পরে অনেকে অন্য দিকে সরে গেছেন কিন্তু সত্তরে লেখা কবিতায় স্পষ্ট সময়ের ছাপ।

অনেকে বলেন সত্তরের রাজনৈতিক কবিতার সঙ্গে চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক কবিতার অন্তর্সাদৃশ্য আছে (১৭)। বামপন্থী কবিতার যে ধারা চল্লিশে শু হয়েছিল তারই সবচেয়ে বড় তরঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটেছিল সত্তরের কবিতায়। অনেক পূর্বজ কবি সত্তরের রাজনৈতিক ঝাঁসে আগ্রহী হয়েছিলেন। যেমন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সাগর চক্রবর্তী কিংবা 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও নানাধররনের লেখার মধ্যে দিয়ে সমর সেন। এঁদের মধ্যে প্রথম ও শেষজন যেন চল্লিশ ও সত্তরের মধ্যে সেই সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন। যেমন, লেখা হয়েছিল 'দেশব্রতী'র পাতায় 'সর্বহারার লড়াইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির যে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে ভূমি আর শ্রমের সংযোগ, তার শোষণের যন্ত্রণাকে সার্থক বিদ্রোহে রূপদান কররার ব্যর্থতাকে দিনকে দিন প্রকট করে তুলেছে। বামপন্থা গেছে শোধনবাদের পথে সংসদীয় গণতন্ত্র ভিতকে পোক্ত করতে । ভিতকে কাঁপিয়ে দিতে নয়। সে আজ ভারতের যা কিছু স্থিতিশীলতার পক্ষে তাকেই গ্রহণযোগ্য ও জনগণের সমর্থনের অংশ বলে প্রমাণ করছে। এমন যেন চামচিকার নিশিকে দিবা ভাবা আর দিবাকে নিশি। তারা জানে না, জোতদার জমিদার ভূস্বামীর হাতে কীভাবে ন্যায্য মূল্য না পেয়ে অনাহারে অনটনে দিন কাটাচ্ছে ভারতীয় কৃষক। শ্রমিকরা আত্মহত্যা করছে। আর তাদের এই বলিদানকে ঝরাপাতার মত ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইছে সংসদীয় দলগুলি। নকশালবাড়ি সংগ্রাম সেই বেইমানিকে ঘৃণা করে, শ্রমিক কৃষকের যন্ত্রণাকে সার্থক বিদ্রোহের রূপ দান করতে চায়। কমিউনিস্ট দলগুলির ভ্রান্ত পথকে সঠিক দিশা দর্শাতে চায়। চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত এই দিশা দর্শাতে অনেক মাসুল দিতে হল ভারতে সর্বহারা জনগণকে। এবার সেই দায়িত্ব নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে।'(১৮) কমিউনিস্ট পার্টির চল্লিশ বছরের সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে এবং আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'মহাসন্দর্ভর বিস্ফোট প্রক্রিয়ার অবশেষে নিষ্ক্রিয়করণ নমুনা।' (১৯) এই নিষ্ক্রিয়করণের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই তিনি উত্তর - নকশালবাড়ি কমিউনিস্ট পার্টির পরিস্থিতি ও ঝাঁয়ন দুনিয়ার অবশেষকে ইঙ্গিত করেছেন। যে মেকরণ শু হয় আশির দশক থেকে। তাই, সত্তরের কবিতা মানে, সেই মেকরনের শেষ উদ্যোগ বা আদর্শের প্রাক - উত্তরাধুনিক পরিস্থিতি, যাতে আধুনিকতার সব লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না, আবার উত্তরাধুনিক খণ্ড - দর্শনেও সেটা পৌঁছায়নি। বিশেষত, সমাজ পরিবর্তনের ব্যক্তিগত ঝোঁকের দিকে যাওয়ার পূর্বাবস্থা, পরবর্তী আশির কবিতায় যা বিদ্যমান। সত্তরের দশক সেই স্বপ্ন - সম্ভবনার সমষ্টিগত শেষ উচ্চারণ।

সত্তর দশকের সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম নবাণ ভট্টাচার্যের 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না', যার দীর্ঘ কথন-বিন্যাসে লুকিয়ে রয়েছে এই 'জাদের উল্লাস মঞ্চ'কে দেশ না বলার ক্রোধ ও সমালোচনার রাজনৈতিক বয়ান। নবাণের পরবর্তীকালের যে প্রত্যাখ্যানের নতুন ভাষ্য বানানোর গদ্য রচনাগুলি, তার আদিরূপ, প্রত্যাখ্যানের, রাজনৈতিক 'অপর' নির্মাণের আঁতুড়ঘর নিশ্চয় এই কবিতাগুলি। পাশাপাশি সৃজন সেনের 'থানা গারদ থেকে মাকে' এমন একটা দীর্ঘ কবিতা, যেখানে একজন রাজবন্দি তার মাকে চিঠি লিখছে। এই গ্রন্থর রচনাকাল ১৯৭৮, তার বার বছর আগে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে রাজনৈতিক বন্দি প্রবীর রায়চৌধুরীকে মাকে লেখা একটি চিঠির অংশঐক্যের সূত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে স্বপ্ন সম্ভাবনার সেই আদর্শবাদী আবেগ কতটা কাব্যময় ছিল, 'সামনে আসবে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি সহ্য করতে হবে, অনেক দুঃখ যন্ত্রণা। তবুও জাহান্নামের আগুনে বসেও আমাদের পুষ্পের হাসি হাসার হিম্মত রাখতে হবে। সমস্ত ত্রিভুবনের সঙ্গে পাঞ্জা কষার হিম্মত রাখতে হবে। আজ পাহাড়ের বুকে জমাট বাঁধা বরফ নদীতে এসেছে বিপুল বন্যা, উদ্দাম স্রোতে পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসছে দুর্বার গতিতে হিমানীপ্রপাত, যা দূর করে দেবে পথের যত বাধা, দূর করে দেবে জঞ্জাল, ঝড়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছে সারা আকাশ জুড়ে। তাই তো এবার বজ্রপাতের মুহূর্ত। ঘুর্নিঝড় আর তরঙ্গ কাঁপিয়ে তুলবে সমুদ্রবক্ষ। বর্ষণশেষের মুক্তক সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করবে আমাদের দেশ। সেই দিনের আশায়ই তো বুক বেঁধে আছি।'(২০) (৭ জুন ১৯৭৪)। এই 'মাতৃমূর্তি' কল্পনা নানা পুরাণ ও মিথের মধ্যে দিয়েও এসেছে, বিপ্লবী চেতনার অংশ বা দেশমাতৃকার বিকল্পরূপ হিসাবে। সারা পৃথিবীর বিপ্লবী সাহিত্যেরই এটা লক্ষণ। যেমন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' অথবা একই সূত্রে ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' কিংবা নিকোলাই অস্ত্রেয়ভস্কির 'ইস্পাত', ইভান তুর্গেনিভের 'মাদার অ্যান্ডচাইল্ড', লুসুনের একাধিক ছোটগল্পের মাতৃচরিত্র। মা কখনও মাথা নত করে না। আত্মসমর্পণহীন আশ্রয়স্থল, বিকল্প দেশচেতনা।

একই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কবিতা লিখেছেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত চৌধুরী, রঞ্জিত গুপ্ত, দীপঙ্কর চক্রবর্তী. অন্যদিকে রাজনৈতিক শহিদ ও কবিদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ ছিল -- দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ, তুষার চন্দ্র, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, মুরারি মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। আবার অকালপ্রয়াত অত্যন্ত শক্তিশালী অন্যাধারার কবি ছিলেন অনন্য রায়, যিনি একই সঙ্গে স্বপ্নাতুর ও বিষাদাক্রান্ত, মহাকাব্যিক ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। লিখেছিলেন, 'কী লাভ জন্মে ও জীবনে? যদি প্রতিদানে পাই অন্তিম শূন্যতা/ পারমাণবিক মৃত্যুর বিকারে?' সত্তরে রচিত কবিতা নিয়ে মৃদুল দাশগুপ্তের অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'জলপাই কাঠের এসরাজ'--এ অত্যন্ত দক্ষ রাজনৈতিক উচ্চারণের মৃত্যুচিহ্ন, মৃত্যু প্রতিরোধের চিহ্ন আর প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর, 'ধরো, সেদিনও এমনই রাত,জালিয়ানওয়ালাবাগে / ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে / দ্রোণাচার্য ঘোষ!/ ভাবো ভাবো সেদিনেরউৎসব! বরানগরের গঙ্গায় জল থেকে / আবার এসেছে উঠে/ তিনশো তণ।' পাশাপাশি জয় গোস্বামী 'ত্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' থেকে 'প্রত্নজীব', 'আলোয়া হ্রদ' --এর কবিতায় ধরা দিচ্ছিলেন নানা অন্তর্মুখী কর্মকাণ্ডের আড়ালে থাকা মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিকে তুলে আনতে, তুলে আনতে মফঃস্বলের ছক, মন-মনস্তত্ত্ব। জয়ের কবিতায় ছিল দুর্মর গতি, আবেগ আর রণজিৎ দাশের কবিতায় ছিল ন াগরিক স্মার্টনেস, শ্লেষ, যে কোনো বিষয়কে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবার মেধা। মেধা ছিল পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কাব্যগ্রন্থ 'দেবী'-তেও। পুরাণকল্পকে আধুনিক ব্যঞ্জনায় বা বলা দরকার, পার্থপ্রতিমের মত জহুরি সত্তরের বহু তণ কবিকে আবিষ্কার করেন, তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সময়ের প্রতি এই দায়িত্বও কম কথা নয়, যখন আমরা সময়ের র াজনৈতিক স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছি।

সত্তরের কবিতা বাংলা কবিতার কলকাতামুখিতা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বহু শক্তিশালী কবি, যাঁদের কথা আগেইউল্লেখ করেছি, তাঁদের বেশ কয়েকজন এবং আরো অনেকেই লিখতে এসেছিলেন গ্রাম - মফঃস্বল থেকে। যেমন, কৃষ্ণনগর থেকে সুবোধ সরকার 'ঋক্ষ মেষ কথা'-য় বিধৃত কবিতাগুলিতে ধরেছিলেন সেই নগর বহির্ভূত জীবনের জটিল তাণ্য, সংশয় অ ার ব্যক্তিগত রাজনীতিকে। আজকের সমাজকথক পরিচয়ের আগে লেখা কবিতাগুলিকে অনেকেই ভাবেন একদম বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে, অথচ খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায়, ঝুঁকি নিয়ে যে কোনো কথা বলতে পারার মত যে শব্দ - রাজনীতি বা জোর, তার একাধিক সূত্র বা পূর্বচিহ্ন রয়েছে সত্তর দশকে লেখা সুবোধের কবিতায়। মেদিনীপুর থেকে লিখতে এলেন শ্যামলকা ন্তি দাশ, গ্রাম - মফঃস্বলের নানা আনপড় ছোঁয়াকে স্মার্টলি ব্যবহার করে একদম অন্য একটা মাত্রা দিয়ে দিলেন তিনি। যেমন, হাওড়ার ব্রত চক্রবর্তীর গদ্যধর্মী উচ্চাররণের মধ্যে দিয়ে চারপাশকে চেনার নাটকীয় উপস্থাপনা ও আরেক জাতীয় অসূক্ষ্ম কবিতা সূক্ষ্ম কবিতার গালে থাপ্পড় কষিয়ে দেওয়ার দুঃসাহসী রাজনীতি। হয়তো তারই সবচেয়ে ব্যাপক উদাহরণ নির্মল হালদার। পুলিয়ার ভাদু-টুসু-ছৌ পর্যন্ত বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতাকে কখনও দীপ্র উচ্চারণে, কখনও নম্র উচ্চ ারণে টেনে নিয়ে গেছেন তিনি। মনে পড়বে বীরভূমের একরাম আলির কবিতাও কিংবা জামসেদপুরের কমল চক্রবর্তী, ব ারীন ঘোষালদের লেখালিখি, শ্রীরামপুরের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগরের অণ চক্রবর্তী, মেদিনীপুরের বীতশোক ভট্টাচার্য, চবিবশ পরগণার বাপি সমাদ্দার, হুগলির সোমক দাস, হাওড়ার গৌতম চৌধুরী, অরণি বসু কিংবা দার্শনিকতায় ঋদ্ধ জীবনচিরন্তনী কবি সুজিত সরকার। এই সূত্রেই আসবে শুদ্ধতার, নির্বাচিতবোধের এক আদ্যন্ত সচেতন কবির কথা, তিনিও পার্থপ্রতিমের মতই,সত্তরের আরেকজন সংগঠক-কবি অনুসন্ধানী - সম্পাদক কবি অনির্বাণ লাহিড়ী, পরে ধরিত্রীপুত্রর কথা। মনে পড়বেআপাত সারল্যকে অনায়াস ব্যবহার করতে পারা অজয় নাগ, আর সেই সারল্যকেই মেধ াবী ব্যবহার করতে পারা গোতম বসু, প্রমোদ বসু, সুব্রত সরকার, সুব্রত দ্রদের কথা। সত্তর এমন একটা দশক যখন বাংলা কবিতায় বহু শক্তিশালী কবির উত্থান ঘটেছিল, যা সংখ্যার হিসাবে আগে - পরে - আর কখনই ঘটেনি। অভিরূপ সরকার, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রা লিখতে এসে সাড়া জাগিয়ে হয়তো পরে ততটা সক্রিয় থাকেননি, কিন্তু অমিতাভ গুপ্ত, তুষার চৌধুরী,প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথ ভড়, ধূর্জটি চন্দ্র, প্রদীপকুমার বসু, শংকর চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র দা, সুরজিৎ ঘোষ, সৈয়দ কওসর জামালরা লিখেছেন ধারাবাহিকভাবে এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হলে। লিখতে এসেছেন মেয়েরা--- রমা ঘোষ দেবাঞ্জ লি মুখোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, অনুরাধা মহাপাত্র, কৃষ্ণা বসু। মেয়েদের লিঙ্গ-সচেতন লেখালিখির জায়গাটা তত পোক্ত

হয়নি তখনও, তবু নিজেদের চেনা চৌহদ্দিটাকেই নানাভাবে অনুভূতির খোঁচায় জাগ্রত করে দেখিয়েছেন এঁরা, শহরের বাইরের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদের গুত্বও কম ছিল না। খুব ব্যক্তিগত জায়গা থেকেই যাঁরা লিখেছিলেন, খুবই মরমী কিংবা বিশুদ্ধতাবাদী কবিতার কথা ; তাঁরাও কী শেষ পর্যন্ত 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'-র কাজে অন্যতর দিক থেকে বাংলা কবিতার এই বিকল্প সমাজ-রাজনীতিকে সাহায্য করে যাননি? কত লিট্ল ম্যাগাজিন,পুস্তিকা, মিনিবুক, মিনিম্যাগের ভেতর দিয়ে আসলে তো সময়ের দমননীতি, আত্রমণ, প্রাতিষ্ঠানিকতার নানাকামড়ের বিদ্ধাচরণ করা ইতিহাসই বের হয়ে এসেছে। সেই পত্র-পত্রিকার সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব যাই বলুক না কেন। সময় যখন যে কোনো নন্দনতত্ত্বকে প্রয়োজনে ঘিরে ধরে, তখন তার বিচিছন্ন বিচার গৌণ হয়ে যায়। ত্রিস্টোফার কডোয়েল তাকেই বলেছিলেন, 'সময়ের নন্দনতত্ত্ব'(২১)। লুই আরগঁ তর্ক করেছিলেন পল এলুয়ারের সঙ্গে (২২), এবং সময়কে ঘিরে গড়ে ওঠা সেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্কের উপসংহার টেনেছিলেন এমনই একটি ফরাসি বাক্যে, প্রতিত্রিয়াশীল কী এই প্রশ্ন হারিয়ে যাবে যদি প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধাক্কায় ভাল - মন্দ একাকার হয়ে ছুট লাগায়। এলুয়ার মানেননি সেই কথা, এমন সাহিত্য-সামর্থ্যহীন বিবেচনার কথা সময়ের ধাক্কায় যা এগিয়ে যাবে তাকে মেনে নিতে হবেই, এতটা মানতে পারেননি তিনি। আর আমাদের 'মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক'-র (২৩) মূলকথা, পার্টিজান সাহিত্যের বিবেক হয় কিনা নিয়ে। সে বিবেকের খোঁজ সত্তর দশক যে করেনি তা বলা যাবে না ; করেছে এবং সেই খোঁজের কারণও তার সময়ের নিজস্ব টিঁকে থাকার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কারণ, সত্তরেই নকশালবাড়ি অবসান ঘটে, জরি অবস্থার পর' (৭৭) সাল থেকে পরবর্তী তিরিশ বছরের বামপন্থী সরকারের পত্তন হয় আর সবচেয়ে ভাঙচুরের দশক --- আশিতে যাওয়ার ইঙ্গিতের মত সত্তর দশকের শেষেও একটা কাকতালীয় আশর্চ্য সভা হয়, সংবিধান থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিলের দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯, স্টুডেন্টস হলের সেই সভায় বিলি করা হ্যান্ডবিলের শেষবাক্য ছিল, 'ঋমানবিকতার নামে আমাদের এই মরণহীন সংগ্রামে ঝাঁপাতে হবে।' (২৪) আশির দশক, এই মানবিকতা প্রতিষ্ঠার দশক। ছোট, বড় নানাধরনের ইস্যুতে সেই মানবাধিকারের ঠিক আছে দিকটি ঋময় গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর সত্তরের শেষ সভাটি যেন মশালটাই তুলে দেয় আশির হাতে।

টীকা ঃ-

১. কৃত্তিবাস, সংকলন ১, সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্যাপিরাস। ১৩৯১। উদ্ধৃত অংশটি ছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরও এমন কিছু প্রসঙ্গ লিখেছিলেন যা সামগ্রিকভাবে এই লেখার 'মূর্তিভাঙা' ঝোঁকটাকেআরও স্পষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে 'কৃত্তিবাস' প্রসঙ্গে যেহেতু, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রথম দশক পঞ্চাশ এবং 'কৃত্তিবাস' দিয়েই তার সূচনা বলে সেই প্রথাবিরোধী উদ্যোগগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। সুনীল লিখেছেন, 'এই কবিতা শুধু সৌন্দর্যের নির্মাণ নয়, রূপকল্পের সন্ধান নয়, এইসব কবিতা যেন তাদের রচয়িতাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুচণ্ডালীকে এতকাল দোষ বলে গণ্য করা হতো, কৃত্তিবাসের কবিদের মতে গু-চণ্ডালিই সঠিক আধুনিক কবিতার ভাষা।...বেশ কিছুদিন সমালোচকদের কাছে বা বিশুদ্ধ কবিতা নামে এক অলীক ভাবালু জিনিসের যাঁরা সমর্থক তাঁদের কাছে কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠী খুবই নিন্দিত ও বিকৃত হয়েছে, বলা হয়েছে এইসব কবিতা অতিচিৎকৃত ওযৌনসর্বস্ব।... আবার বুদ্ধদেব বসুর মতন কবি এবং 'কবিতা' পত্রিকার সমার্থ সম্পাদক বলেছিলেন, তোমাদের কবিতা বেশি জটিল, আমি বুঝতে পারছি না।'

২. কৃত্তিবাস, সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১ আগস্ট ২০০৩। 'কৃত্তিবাসের কাল' নামের একটি রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর সঙ্গে 'প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ' রণজিৎ গুহর সঙ্গে আলাপের সময় শ্রীগুহ তাঁকে 'কৃত্তিবাস' -এর পঞ্চাশ বছর পালনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন এবং 'কৃত্তিবাস'-এর 'ঐতিহাসিক গুত্বের' ইঙ্গিত দেন।

৩. তত্ত্ববাক্যটি মুলত মালটিকালচারলিজম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'প্লুরালিজম' প্রসঙ্গে বলেছেন জর্ডন এবং উইড ন। আর হোমি ভাবা উত্তর ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে তর্ক উঠতে পারে, তার বিপরীত যুক্তিগুলোকে সূত্রায়িত করেছেন। যদিও তিনি তখন মিখাইল বাখতিনের 'পলিফোনিক নভেল'-এর ধারণাকে তুলে এনেছেন দস্তয়েভস্কির সঙ্গে উপনিবেশের

আধুনিকতার তুলনা করতে।

৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। 'সাহিত্য ভাবনা' পত্রিকা। ১৯৮৮। উদ্ধৃত বাক্যটার পূর্ববর্তী অংশ হল 'সাহিত্যে কল্পনার স্থান অতি উঁচুতে। এতটাই উঁচুতে যে তাকে সবসময় ধরা- ছোঁয়া যায় না। কল্পনা করেকরে বানিয়ে যাঁরা তাঁরাও সেই ধরা - ছোঁয়ার বাইরে উঁচুতেই থাকুন। নেমে এসে আমাকে ছুঁয়ে দেবার দরকার নেই। আমি কখনই বানিয়ে বানিয়ে, আদর্শকে মাথায় রেখে, মতামতের জয় ঘটাতে হবে বলে লিখি না।'
৫. পভার্টি অ্যাণ্ড পলিটিকশ আফটার ইন্‌ডিপেনডেন্‌স রণজিৎ গুহ। অনুবাদ স্বপ্ন দাশগুপ্ত 'ঐক্যশক্তি'পত্রিকা, ১৯৯৯।

৬. ইন্ডিয়ান ইকনোমিক পলিসি ১৯৪৭ - ৭৭ বিনায়ক পট্টানায়ক। বেনথাম বুক্স। ১৯৮৮। স্বাধীনতা - উত্তর অর্থনৈতিক পর্যালোচনার মূল কেন্দ্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো এবং বিনায়ক দেখিয়েছেন, তাতে নেহর ব্যক্তিগত চরিত্র - লক্ষণ অস্থিরতা ও স্ববিরোধিতার নানা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, বিশেষ করে প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক স্তরে। পরিকল্পনার অন্তর্গত একাধিক অপছন্দের অফিসারদের বদল ঘটিয়েছেন, জরি মিটিঙের মাধ্যমে পুরনো সিদ্ধান্ত বদল করেছেন আর আদর্শর চেয়েও বেশি আবেগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এগুলো স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ক্ষণভঙ্গুর, বিশৃঙ্খল রাজনীতি বা দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রকাশ করে।

৭. নেশার বাঙালি রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। সোনার বাংলা, ৫ এপ্রিল ১৯৯৪। যে কোনো বার অথবা মদের ঠেকেরতুলনায় খালাসিটোলা ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অতি আাদকে সহ্য করা সবচেয়ে সস্তার মদের ঠেক। নানা কীর্তিবান মদ্যপায়ীদের কারণে তাতে যাওয়ার আাদও যে কোনো বাঙালি নেশার পক্ষে কম ছিল না। রাধাপ্রসাদ গুপ্তই 'ঠেকের নিদান' প্রসঙ্গে 'খালাসিটোলার নিদান'-কেও পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের ঠেকবাজি আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

৮. অস্থিরতার ভারত, শরীর ও মন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভারতের ইতিহাস রচনা আলোচনা সংখ্যা ; 'নবপত্র', ১৯৯৮
৯. নিম্নবর্গের ইতিহাস। সম্পাদনা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র। আনন্দ। যদিও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত লেখাটি দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি রিভিউ' (২০০০)-তে প্রকাশিত, 'পার্টিশন আ প্রাইমারি গাইড টু আওয়ার কালচার'।

১০. পল গ্রিনো তেতাল্লিশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে দেখিয়েছিলেন এই অর্থনৈতিক অবরোধ কীভাবে অপরাধের চক্রবৎ পরিস্থিতি তৈরি করে। 'দুর্ভিক্ষের বাংলা', ১৯৯৫, চিন্তক।

১১. হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন উত্তম দাস। মহাদিগন্ত। তাছাড়া 'কৃত্তিবাস' ১৯৬৬-তে সুনীল লেখেন, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ভাল কি খারাপ আমরা জানি না। ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নেই। এ পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি চোখে পড়েনি। নূতনত্ব প্রয়াসী সাধারণ রচনা কিছু কিছু হাস্যকর বালক ব্যবহার দেখা গেছে।'

১২. ইস্তাহারটি সন্দীপ দত্ত রচিত 'বাংলা গল্প-কবিতা অন্দোলনের তিনদশক' বই থেকে গৃহীত।

১৩. মলয় রায়চৌধুরী 'অ' বইতে এই কবিতাটি সম্পর্কে যে নিরীক্ষা - প্রবণতার দিকগুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি মূলত গতি, যৌনতা, প্রেম, ক্ষোভ আর মূল্যবোধকে আক্রমণ করা বিষয়েই।

১৪. আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকার সাংবাদিক লুই কার পশ্চিমবঙ্গে আসেন এবং 'ইন্ডিয়া দ্য হাংরি জেনারেশন' শিরোনামে ১৯৬৪-র ২০ নভেম্বর সংখ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ সংবাদ - পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়।

১৫. ষাট - দশকের কবিতা মণীন্দ্র গুপ্ত। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, সম্পাদক, সম্পাগক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৯৯। পৃ. ১৮৯।

১৬. নতুন কবিতা প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। 'কবিতা প্রবাহ', যুগান্তর, ১৯৭১, ১নভেম্বর। প্রণবেন্দু লিখেছেন, 'ভাস্কর' বুদ্ধদেব ও মানিকের কবিতায় পূর্ব ইউরোপের কবিতার গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে ওঠা অ্যান্টি পোয়েট্রির প্রভাব আছে।
১৭. বাংলার রাজনৈতিক শিল্প- সাহিত্য শিশিরকুমার দাস। গণনাট্যের 'স্মারকগ্রন্থ' রূপে প্রকাশিত। ২০০০।
১৮. দেশব্রতী, ১৯৭১, মার্চ। নির্বাচিত দেশব্রতী সংকলন সম্পাদক অর্জুন মজুমদার। দ্রোহ ২০০১।
১৯. বিপ্লবী রাজনীতির বাংলা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদ মৃণাল প্রধান। কালান্তর, ২০০০ জানু।
২০. নির্বাচিত লেখা ও চিঠিপত্রের সংকলন প্রবীর রায়চৌধুরী। স্মরণ কমিটি। কলকাতা।
২১. ইলিউন অ্যান্ড রিয়ালিটি ত্রিস্টোফার কডওয়েল। চিরায়ত প্রকাশন। কলকাতা।
২২. পলিটিক্স অ্যান্ড লিটারেচার, অ পলিটিক্যাল ডিরেট পল এলুয়ার, লুই আরগঁ। ইংরেজি অনুবাদ জে. স্যামসন। প্রগ্রেসিভ প্রেস, ১৯৮০। শোনা যায় এই বইটির বাংলা অনুবাদ শু করেছিলেন অন মিত্র।
২৩. মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক। সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস। কণা প্রকাশনী। কলকাতা।
২৪. 'সংবিধান থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল কর' শিরোনামে এক ফর্মার পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত সভাস্থলে বিলি করা হ্যান্ডবিল। প্রকাশকাল, ১ জানুয়ারি ১৯৮০। এ অভিমতের পিছনে নকশালপন্থী ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডর হাত থেকে রক্ষা করার গোপন প্রয়াস থাকলেও, এই ধরনের দাবি ভারতের নানাজায়গায় সেই সময় শোনা গিয়েছিল কুলদীপ নায়ার, আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার, বাবা আমতে, প্রতিমা বেদি, কুসবন্ত সিং, নিখিল চক্রবর্তীদের মুখে। সেসব গণতান্ত্রিক মানবাধিকার অন্দোলনের অংশ রূপেই স্বীকৃত হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, পরবর্তীকালের অপ্রতিষ্ঠানিক, দলমতশাসিত আন্দোলনের বাইরে যে খণ্ড খণ্ড আন্দোলন ও দাবির পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে তার মধ্যে এই ধরনের একই ব্যক্তিদের সংযোগ বারে বারে দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ একে ব্যক্তিবাদী ঝোঁকও বলেছেন। যদিও, আশির দশক থেকে রাজনীতি সমাজনীতি - আইনের নানা রদবদলে এদের ভূমিকা কম নয়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com